Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 197 –202
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' : দাঙ্গার এক অনালোকিত ইতিকথা

ড. সুপেন্দ্র নাথ রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম
ইমেইল : supendra.khalaigram@gmail.com

Keyword
শাসক, শাসিত, বিদ্বেষের বীজ, পরাধীন ভারত, দাঙ্গা, খুন, লুণ্ঠন, পলায়ন, নারী ধর্ষণ, আশ্রয়, নির্মাণ।

Abstract
যে কোনো শাসকই শাসিতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্যে নানা কূটকৌশল অবলম্বন করে। পরাধীন ভারতের শাসক ইংরেজরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তারা সর্বদা চেষ্টা করত হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের জাল ছড়িয়ে দিতে। ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ব্যাপক দূরত্ব তৈরি হয়। আর এই দূরত্বই ফাটলের আকার ধারণ করে ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে। ১৯৪৬ সালে দেশে যে দাঙ্গার উত্থান ঘটে তাতে দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরই প্রাণহানি ঘটে। ঘর-বাড়ি ধ্বংসও, সম্পত্তি লুণ্ঠন, জন্মভূমি ছেড়ে পলায়ন, খুন ও আর্ত মানুষের চিৎকারে সেদিন ভারি ভারি হয়ে উঠেছিল ভারতের আকাশবাতাস। বলা বাহুল্য এই রাষ্ট্রিক ও মানবিক সংকটকালে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হয় নারীরা। কত নারী যে সেদিন ধর্ষিত হয়েছিল তার সঠিক হিসেব জানা নেই। কেউ আবার সম্মান রক্ষার্থে কুয়োয় পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। এই সংকটকালে চুপ করে থাকেননি সংবেদনশীল সাহিত্যিকরা। তাঁদের লেখনী হতে একে একে উঠে আসে বহুবিচিত্র বেদনাতুর আখ্যান। ঔপন্যাসিক জ্যোতির্ময়ী দেবী এই সংবেদনশীল লেখকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটিও দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে নির্মিত। তবে তিনি এখানে আমাদেরকে দাঙ্গার এক অনালোকিত ইতিকথার দৃশ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। খুন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, প্রাণে বাঁচার তাগিদে স্বদেশ ছেড়ে পলায়ন কিংবা জন্মভূমিকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চাওয়া ইত্যাদি দিকগুলি নিয়ে অসংখ্য গল্প-উপন্যাস নির্মিত হয়েছিল এবং হচ্ছেও। কিন্তু দাঙ্গাকালে যে মেয়েটি হিন্দু কিংবা মুসলিম পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল, দাঙ্গা শেষে সেই মেয়েটি কি তার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পেরেছিল? যদি সে ফিরে না যায় সেক্ষেত্রে তার কী পরিণতি হয়? আর যদি বা তাকে তার পরিবারের লোকজন ফিরিয়ে নেয় তবে সেখানে কতটা আন্তরিকতা ছিল? নাকি তাকে আবার নির্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়? দাঙ্গার এই অনালোচিত দিকটিই এই নিবন্ধে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে আলোচিত হয়েছে।

Discussion

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮) অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি বাংলার বাইরে সুদূর রাজস্থানে বসবাস করেও বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৮৯৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি জয়পুরের এক প্রবাসী বাঙালি পরিবারে তাঁর জন্ম। মাত্র ১০ বছর বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হন তিনি। 'মরার উপর খাঁড়া' নেমে আসে ২৫ বছর বয়সে। কারণ এই সময়েই তিনি বিধবা হন। ৬টি সন্তান নিয়ে স্বামীর ঘর পরিত্যাগ করে তিনি পুনরায় ফিরে আসেন পিতৃগৃহে-জয়পুরে। অর্থাৎ বাল্যবিবাহের জন্যে একদিকে যেমন তিনি পড়াশুনা করতে পারলেন না অন্যদিকে অকালে বিধবা হওয়ার ফলে দীর্ঘ সংসারজীবনও করতে পারলেন না। ফলে এক নিদারুণ জীবনযন্ত্রণায় তিনি অনবরত দগ্ধ হন। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন তিনি। নানা লেখাতে তিনি তাঁর এই যন্ত্রণাকে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই জীবনযন্ত্রণা ও নিঃসঙ্গতা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তিনি একদিকে যেমন সাহিত্য অধ্যয়ন করেন তেমনি তার পাশাপাশি দেশ পরিভ্রমণও করেন। ফলে জীবন ও মানুষ সম্পর্কে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন। সেইসঙ্গে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। আর এই আত্মসমীক্ষার প্রতিক্রিয়া হিসেবে একে একে তাঁর কলম হতে উঠে আসে যুগান্তকারী সব লেখা। তবে বাঙালি হলেও তাঁর লেখার পরিসর শুধুমাত্র বাঙালিদের জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়নি। ভারত ভ্রমণ করার দরুন অবাঙালি চরিত্ররা অনায়াসে তাঁর লেখায় এসে হাজির হয়। অর্থাৎ বলা যায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত। এ প্রসঙ্গে সম্পাদকদ্বয় (সুবীর রায়চৌধুরী, অভিজিৎ সেন) যথার্থই বলেছেন,

> "নারীসমস্যাই হক অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনই হক, জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁকে সবসময় দেখেন সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে। এবং সেটা তিনি করেন অনায়াসে। তাঁর লেখা বাঙলা, কিন্তু তিনি ভারতীয় লেখক।"[১]

তাঁর সাহিত্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমাজের শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত-অত্যাচারিত মানুষের যন্ত্রণার কথা। বিশেষ করে নারীর জীবনযন্ত্রণার কথা তাঁকে বারংবার ভাবিয়েছে। তাঁর মনে বারবার এ প্রশ্নের উদয় হয়েছে যে, কেন নারীদের এত দুর্গতি? সমাজের জাঁতাকলে কেন নারীরাই সবচেয়ে বেশি পিষ্ট হয়? কেন? কেন? কেন? তাঁর এই জিজ্ঞাসুমনের অন্যতম ফসলই হল 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'(১৯৬৮) উপন্যাসটি। উপন্যাসটি ১৯৪৬-'৪৭ সালের দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রেক্ষিতে নির্মিত। এই দাঙ্গা ও দেশভাগের সময় সমাজের নারীরা যে নিদারুণ সমস্য ও অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল তা এখানে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে তুলে ধরা হবে।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তার নাম ছিল 'ইতিহাসে স্ত্রী-পর্ব'। আবার ১৯৬৮ সালে যখন উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন এর নাম বদলে হয় 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। এ প্রসঙ্গে জ্যোতির্ময়ী দেবী 'আমার কথা' অংশে লিখেছে,

> "এই লেখাটি 'প্রবাসী' শারদীয় সংখ্যায় 'স্ত্রী-পর্ব' নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মহাশয়ের অনুরোধে নামটি পরিবর্তিত করা হলো।"[২]

কিন্তু উপন্যাসটির নিবিড় পাঠের পর মনে হয় পূর্বের নামটি পরিবর্তিত না হলেই নামকরণটি যথার্থ হত। কারণ ঔপন্যাসিক তো শুধুমাত্র 'এপার গঙ্গা আর ওপার গঙ্গা'র নারীদের দুর্গতির চিত্র তুলে ধরেননি, বিশ্বের ইতিহাসে কোথায় কীভাবে নারীরা চরম দুর্গতির শিকার হচ্ছে সেদিকটিও তুলে ধরেছেন। সবচেয়ে মোক্ষম দৃষ্টান্ত হল উপন্যাসটির উৎসর্গ অংশ। সেখানে তিনি লিখেছেন যে, উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হল- "সকল যুগের সকল দেশের অপমানিতা লাঞ্ছিতা নারীদের উদ্দেশে।"[৩] সুতরাং উপন্যাসটির উৎসর্গ অংশে যেখানে সংকীর্ণতার কোনো বালাই নেই সেখানে উপন্যাসটির নামকরনের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার বেড়া অবশ্যই অতিক্রম করা যেত।

সম্পাদকদ্বয়ের নিবেদন অংশে আছে-

> "দাঙ্গা-দেশবিভাগ নিয়ে নানা ভাষায় বহু গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে, কিন্তু বাঙলার এবং পাঞ্জাবের মেয়ে একই সঙ্গে উপস্থিত। এরকম কাহিনী বিরল।"[৪]

সম্পাদকদ্বয়ের এই মন্তব্য অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল বাংলার আর পাঞ্জাবের মেয়েরা ১৯৪৬-'৪৭ সালের দাঙ্গা-দেশভাগের সময় কী ধরনের সংকটে পতিত হয়েছিল? আবার দাঙ্গা ও দেশবিভাগ যখন সমাপ্ত হল তখন তাদের

জীবনে আর কী ধরনের সংকট দেখা দিল? যে হিন্দু মেয়েটি দাঙ্গার সময় তার পিতামাতাকে হারিয়ে মুসলিম পরিবারে আশ্রয় নেয়, পরে সেই মেয়েটিকে কি তার পরিবারের আত্মীয়স্বজনেরা ফিরিয়ে নিয়েছিল? যদি তাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়– তা কেমন করে? আর যদি তাকে ফিরিয়ে না নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সেই আশ্রিত মেয়েটির কী দুর্গতি হয়? দাঙ্গার এই অনালোকিত ইতিকথারও এই নিবন্ধের মাধ্যমের উদ্ঘাটন করা হবে।

আমরা জানি শাসক তার রাজত্বকে কণ্টকমুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে। এরকমই একটি কৌশল বা হাতিয়ার হল প্রজাদের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে তারা সর্বদা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সরকার ঠিক এই হাতিয়ারটিই সুকৌশলে প্রয়োগ করে। ভারত শাসন করতে গিয়ে ১৮৫৭ সালে তারা যখন আবিষ্কার করে যে, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে নামছে তখন তারা উপলব্ধি করে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করতে না পারলে দীর্ঘকাল ভারত শাসন করা মুস্কিল হবে। আর আমরা ভারতীয়রা খুব সহজেই শাসকের এই ফাঁদে পা দিই। ফলস্বরূপ ১৯৪৬ সালে দ্রুত দেশে ছড়িয়ে পড়ে দাঙ্গার আগুন। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই মেতে ওঠে রক্তপানের খেলায়। চেনা প্রতিবেশি হয় অচেনা, বর্বর, নৃশংস ও খুনি। '১৯৪৭-৪৭' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ তাই লেখেন-

"মানুষ মেরেছি আমি – তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ ক'রে ঘুমাতেছি -"

বলা বাহুল্য যে, যে কোনো বিপর্যয় তা সে প্রাকৃতিকই হোক আর মনুষ্যসৃষ্টই, তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয় নারীরা। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় তাই-ই ঘটে। এই নরমেধ যজ্ঞের সবচেয়ে বেশি শিকার হয় নারীরা। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটি দাঙ্গাপীড়িত লাঞ্ছিত নারীদেরই একটি বেদনাতুর আখ্যান। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটি পাঠ করে আপাতদৃষ্টিতে পাঠকের মনে হতেই পারে যে, উপন্যাসটি মূলত সুতারা দত্ত নামে দাঙ্গাপীড়িত এক নারীর আখ্যান। কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এই কাহিনি শুধু সুতারার কাহিনি নয়, দাঙ্গাপীড়িত হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের নামহীন আসংখ্য নারীদেরও কাহিনি। এদের মধ্যে কেউ খুন হয়, কেউ ধর্মান্তরিত হয়। আবার কেউ বা সম্মান রক্ষার্থে গলায় দড়ি দিয়ে কিংবা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যাও করে। এইসব পীড়িত নারীদেরই প্রতিনিধি হল সুতারা। উপন্যাসকার তাই যথার্থই বলেছেন,

> "অকারণে লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা, উপেক্ষিতা, পরিত্যক্তা নারীর সবকালের মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে যেন সে মনে মনে।"[৫]

উপন্যাসটির কাহিনি হতে জানা যায় যে, নোয়াখালির একটি গ্রামে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বসবাস করে আসছিল। দুই সম্প্রদায়ই যেমন একে অন্যের হাঁড়ির খবর রাখত তেমনি বিপদের দিনে পাশেও দাঁড়াত। এরকমই দুটি পরিবার হল গোপাল দত্তের পরিবার আর তমিজুদ্দিনের পরিবার। গোপাল দত্ত আর তমিজুদ্দিন দু'জনই একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক। গোপাল দত্তের কন্যা সুতারা আর তমিজুদ্দিনের কন্যা সাকিনা দু'জনই সহপাঠী ও ভালো বন্ধু। সুতারা আর সাকিনার খেলার সাথী হল ফতিমা, সোফিয়া, হাসিনা, মেহের রোশন, ঊষা, বীণা, অলকা আর দুর্গা। মোটকথা সর্বদা একটি সম্প্রীতির পরিবেশে তারা বাস করত। কিন্তু একদিন হঠাৎ ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গার রেশ নোয়াখালির এই শান্ত গ্রামটিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্বচক্ষে সুতারা দেখে রক্তের খেলা। পিতা খুন হয়, মা পুকুরে ঝাঁপ দেয়, দিদি সুজাতাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। কারা এসব করল? রহিম আর করিমরা, যারা সুতারাদের বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করত। যাদেরকে সুতারার মা অত্যন্ত স্নেহ করত, ভালোবাসত। তাই অভূতপূর্ব এই হত্যাযজ্ঞ দেখে বেহুঁশ হয় সুতারা। যখন তার হুঁশ ফেরে তখন সে তমিজুদ্দিন সাহেবের বাড়ির বিছানায়। আসলে সব হিন্দুই এবং সব মুসলমানই যে দাঙ্গায় জড়িত ছিল না তমিজুদ্দিনের মতো এক উদার চরিত্র

নির্মাণ করে ঔপন্যাসিক সেকথাই আমাদের জানিয়ে দিলেন। তমিজুদ্দিন সাহেব দীর্ঘ ৬ মাস সুতারাকে কন্যাস্নেহে দেখভাল করেন। শুধু তাই-ই নয়, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সুতারাকে কলকাতায় তার দাদার কাছে পৌঁছেও দিয়ে আসেন। বাংলা সাহিত্যে এধরনের চরিত্র সত্যিই বিরল।

কিন্তু অনাথ সুতারা কি শেষপর্যন্ত তার দাদার ঘরে আশ্রয় পেল? যথার্থ সম্মান পেল? না। সম্মান পাওয়া তো দূরের কথা, উপযুক্ত আশ্রয়টুকুও সুতারার কপালে জুটেনি। অনাথ সুতারার যে স্নেহ-সহানুভূতি-ভালোবাসা পাওয়া দরকার ছিল তা সে অমূল্যচন্দ্র ছাড়া আর কারও কাছেই পায়নি। উপরন্তু তাকে প্রতিমুহূর্তে সহ্য করতে হয় লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ভাব নিয়ে দাদা সনতের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার সঙ্গে ব্যবহার করতে থাকে। দাদার শ্বশুরবাড়িতে দীর্ঘ ৫ মাস সুতারাকে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। কেন? তারা এমন করল কেন? কারণ সুতারা মুসলমানের ঘরে ছিল। সত্যিই তো। আজও যখন আমরা কোনো মুসলিম পরিবারের বাড়িতে গিয়ে দ্বিধাহীনভাবে খেতে কিংবা থাকতে পারিনা সেখানে দীর্ঘ ৬ মাস তমিজুদ্দিনের বাড়িতে থাকার পর কীভাবে সুতারাকে তার পরিবারের লোকজন মেনে নেবে। পরিবারের গৃহিণী ও অন্যান্যরা তাই বলে-

> (ক) "এতদিন ধরে মুসলমানের ঘরে পড়েছিল। এক-আধদিন নয়, ছ'মাসের ওপর। তাতে কি আর মেয়েমানুষের জাত জন্ম থাকে। তাকে এনেছিস, বেশ করেছিস। তা একপাশে হাড়ী-বাগদির মতো বসে দাঁড়িয়ে থাক, তা না সব যজাতে, একাক্কার করতে বসলো। কিছু আর বাকি রইলো না। কি না খেয়েছে। কি করেছে না করেছে কে তার খবর জানে!"[৬]
>
> (খ) "হ্যাঁ। একটা আচার-ধর্ম নিয়ম আমাদের হিন্দুদের আছে তো। তাতে তো ওরকম সব মেয়েদের ঘরে তুলে মিলিয়ে নেওয়ার নিয়ম নেই। তফাতে রাখতেই হয়। মুসলমানের অন্ন খেয়ে এলো। ঘরে বাস করে এলো। সমাজে নেয় কি করে লোকে।"[৭]
>
> (গ) "তারপর বোনের কি কোনো গতি হবে, না বিয়ে-থা হবে কোনোদিন? সে কথা তো ভাবতে হয়। আর ঐ মেয়ে ঘরে থাকলে ওর নিজের মেয়ের বিয়ে দেওয়াই শক্ত হবে।"[৮]
>
> (ঘ) "এসব ভগবানের ইচ্ছে। ওর কর্মফল। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম খারাপ হলেই মানুষের বিপদ হয়। ও-ছুঁড়ির ইহকাল-পরকাল গেছে। ওর কপালে দুঃখ লেখাই রয়েছে। কে রক্ষা করবে।"[৯]
>
> (ঙ) "অনাচারী, মেলেচ্ছ ঘরে থাকা মেয়ে, আনার দরকার কি ছিল? তার কপালে যা হবার তা হয়েই ছিল। সেখানেই পড়ে থাকতো। সে দেশের এমন কত মেয়ে পড়ে আছে। আর এতদিন ওদের ঘরে থাকা মেয়ের জাত-ধর্ম কি আর কিছু আছে? কি খেয়েছে না খেয়েছে! কি হয়েছিল! যার কথা কেউ কিছু জানে না।"[১০]

এভাবে অনবরত কটূক্তি শুনতে হয় সুতারাকে। তাকে শুনতে হয় সে বাড়িতে থাকলে তার দাদার মেয়েদের বিবাহ দিতে সমস্যা হবে। মুসলমানের ঘরে থাকার, মুসলমানের অন্ন খাওয়ার জন্যে কটূক্তিও শুনতে হয়। শুনতে হয় তার জীবনের এই অবস্থার জন্যে ভাগ্যই দায়ী। এভাবে ধীরে ধীরে সুতারাকে একধরনের অবজ্ঞা ও একাকিত্বের দুনিয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সে মুসলমানের ঘরে ছিল, মুসলমানের অন্ন খেয়েছিল – এই ইতিকথাই সমাজে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। অথচ সে যে মুসলমানের হাত ধরে মৃত্যুর মুখ হতে বেঁচে ফিরে এল সমাজে এই ইতিকথার কোনো গুরুত্বই থাকল না। কিন্তু কোনো ছেলের যদি এই অবস্থা হত? না। ওদের জাত যায় না। কারণ তারা পুরুষ মানুষ। গৃহিণী বলেন, "তা তোমরা পুরুষ মানুষ। অনাচার করলে দোষ হয় না। সবাই জানে। শাস্ত্রে আছে।"[১১] অর্থাৎ লিঙ্গভেদে যে ইতিহাস নির্মাণ করা হয় জ্যোতির্ময়ী দেবী তা দেখিয়ে দিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেসমস্ত কটূক্তি সুতারাকে শুনতে হয়েছে সবগুলিই কিন্তু মহিলাদের মুখ হতে নির্গত হওয়া কটূক্তি। আসলে এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। নারীর শত্রু নারীই - এই দিকটি যেমন এখানে প্রতিফলিত হয় তেমনি নারীসম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে পরিবারের নারীরাই যে প্রধান ভূমিকা পালন করে সেই দিকটিও এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এই পরিবারের অমূল্যচন্দ্র চরিত্রটি একমাত্র ব্যতিক্রমী চরিত্র। সম্পর্কে তিনি সুতারার তালুই। একমাত্র এই মানুষটির কাছেই সুতারা কিছুটা স্নেহ-সহানুভূতি পেয়েছে। কিন্তু পরিবারের গৃহিণীর মতো ছুঁচিবাই লোকেদের জন্যে তিনি সুতারার বিষয়ে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হন। আসলে অমূল্যচন্দ্রের মতো কিছু উদারমনের

মানুষ সুতারাদের সাদরে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু মৌলবাদী সমাজের চাপে শেষপর্যন্ত তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। নিরুপায় এই মানুষটি তখন নিজেকে শান্ত্বনা দেয় এভাবে-

> "যদিও ঐ ভীতত্রস্ত অসহায় কোমল তরুণ মুখখানি তাঁকে বিব্রত ক'রে তুলেছিল বটে, কিন্তু নিজের ঘরের 'ঘটিবাটি না সামলে' কে কবে পরের জন্য, বিশেষ করে একটি কুটুম্ব মেয়ের জন্য উদ্বেগ ভাবনা বহন করেছে? স্বয়ং রামচন্দ্রই স্ত্রীর জন্য পারেননি। চকিতে মনে পড়ে যায়, কই জনক রাজাও তো সীতার জন্য এগিয়ে আসেননি! রামায়ণের ইতিহাসে কিছু পাওয়া যায় কি?"[১২]

উপন্যাসে উল্লিখিত এই মন্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। কারণ এখানে ঔপন্যাসিক রামায়নের নবনির্মাণ করেন। তবে উপন্যাসটির একাধিক জায়গায় রামায়ণ-মহাভারতের উল্লেখ আছে। মোদ্দাকথা সেই রামায়ণ-মহাভারতের কাল থেকেই নারীরা যে অনাচার ও অবিচারের শিকার ঔপন্যাসিক সেকথাই আমাদের জানান দিতে চেয়েছেন। ঔপন্যাসিক তাই যথার্থই বলেছেন,

> "কিন্তু এ-সুতারার অনেক বয়স হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যুগ-যুগান্তরের বয়স তার দেহে মনে রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। সব কালের সব যুগের ইতিহাসের লেখায়-সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগে সে বয়স মিশে গেছে। মিশে যাচ্ছে।"[১৩]

শেষ পর্যন্ত এই সব কটূক্তিই নির্বাসনের রূপ ধারণ করে। সীতার মতো সুতারারও নির্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। সমাজবহির্ভূত অসংখ্য মেয়ের মতো সুতারারও স্থান হয় বোর্ডিঙে। সুতারাকে আর ঘরে ফিরে আনার নামোচ্চারণ পর্যন্ত করা হয় না। এই বোর্ডিঙে থেকেই সুতারা বি.এ. পাশ করে, এম.এ. পাশ করে। পড়া শেষে দিল্লির যাজ্ঞসেনী কলেজে তার চাকরিও হয়। এখানে এসে সহকর্মী কৌশল্যাবতীর কাছ থেকে দাঙ্গার কথা শ্রবণ করে সুতারা নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করে। দাঙ্গাপীড়িত সকল নারীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় সে। সুতারাং উপলব্ধি করে তার মতো বাঙালিরাই শুধুমাত্র দাঙ্গা-দেশভাগের শিকার নয়, কৌশল্যাবতীর মতো পাঞ্জাবিরাও দাঙ্গা ও দেশভাগের শিকার। অর্থাৎ কৌশল্যাবতী চরিত্রটি নির্মাণ করে ঔপন্যাসিক দাঙ্গা ও দেশভাগের বিষয়টিকে জাতীয়স্তরে ছড়িয়ে দেন। কৌশল্যাবতীর কাছ হতে সুতারা এও জানতে পায় – মুসলিম নারীদের ওপর হিন্দুদের অকথ্য অত্যাচারের কথা। ফলে দাঙ্গাপীড়িত সকল লাঞ্ছিত নারীদের বেদনার মধ্য দিয়ে সে নিজের বেদনাকে দেখতে পায়। তাই সে ভাবে,

উপন্যাসটির শেষ অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক সুতারা-সমস্যার সমাধান করেন প্রমোদের সঙ্গে তার বিবাহের ইঙ্গিত দিয়ে। সুতারার ভার প্রমোদ নেওয়াতে সুতারার মনে হতেই পারে-

> "তার পৃথিবীর মতো ভারী দেহটা সহসা হালকা হয়ে গেছে!"[১৫]

কিন্তু সুতারার মতো আরও যেসব অসংখ্য উদ্বাস্তু মেয়ের বিবাহ হয়নি তাদের কী হল? এদেরকে দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ কোনো প্রমোদ এসে বলেছিল কি,

> "আমি তোমার সব ভার নিলাম সুতারা।"[১৬]

যাদের ভার নেওয়া হয়েছে তাদেরকেও কি সুতারার মতো কটূক্তি শুনতে হয়েছে? আর যাদের ভার নেওয়া হল না তাদের জীবনের শেষ পরিণতি কী হল? এরা কি আজীবন সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েই রইল? নাকি তাদের শেষ ঠিকানা হয় নিষিদ্ধ পল্লি? বাকি সুতারাদের পৃথিবীর মতো ভারী দেহ সত্যিই কি হালকা হল?

তথ্যসুত্র :

১. দে, সুধাংশুশেখর (প্রকাশক) : জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করন-এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৫
২. তদেব, পৃ. ৯৬
৩. তদেব, পৃ. ৯৩
৪. তদেব, পৃ. ৬
৫. তদেব, পৃ. ১৪২

৬. তদেব, পৃ. ১২০
৭. তদেব, পৃ. ১২৪
৮. তদেব, পৃ. ১২৫
৯. তদেব, পৃ. ১২৭
১০. তদেব, পৃ. ১৮১
১১. তদেব
১২. তদেব, পৃ. ১২৯
১৩. তদেব, পৃ. ১৪২
১৪. তদেব, পৃ. ১৫২ - ১৫৩
১৫. তদেব, পৃ. ১৮৯
১৬. তদেব, পৃ. ১৮৭